চল মন অবন্তিকা

বরুন দাস

।। উজ্জয়িনী কুম্ভমেলায় স্নান ।।

অথর্ববেদের মন্ত্রে একটা শব্দ আছে - দুঃখ তস্করম্। তস্কর অর্থের চোর। চোর মানুষের পার্থিব সম্পদ টাকা সোনা রূপা হীরে জহরৎ ইত্যাদি অপহরণ করে। কিন্তু শিবসুন্দর হরণ করেন মানুষের দুঃখকষ্ট, আধি - ব্যাধি। এটি লক্ষ ভক্ষ ভক্ত এবং ঋষি মুনিদের উপলব্ধ সত্য। তাইতো অনাদিকাল ধরে শিব আমাদের আরাধ্য দেবতা। আর ইনিই সত্যিকারের অ াইকন হবার যোগ্যতা রাখেন। প্রণবানন্দও স্বয়ং শিব। তাঁর হাতের ত্রিশূল জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করে, আর্ত - পীড়িতজনকে রক্ষা করে, দুর্বলকে অভয় দান করে। জীবন্ত শিবরূপেই প্রণবানন্দ চির বর্তমান।

আশ্রমের পুজারতি শেষ। রাতের প্রসাদ বিতরণও শু হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আমরাও বসে পড়ি ভক্তদের লম্বা লাইনে। আশ্রমের নিরামিষ আহারে আমাদের উভয়েরই সমান আগ্রহ। সুতরাং পরম তৃপ্তি আনে পরিবেশিত আহ ার্য বস্তু।

আমিষ নিরামিষ নিয়ে আমাদের প্রচলিত ধ্যান - ধারণার বিপরীত পরিচয় পাই বেদেব গোলাধ্যায়ে। বিষয়াভিলাষং আ মিষং, তদরাহি ত্যং নিরামিষংবা। অর্থাৎ বিষয়াসক্তিই যথার্থ আমিষ ভোজন। বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তি জন্মালে তবেই তাকে নিরামিষাশী বলা হয়। দুধ, তুলসীপাতা বা ফলাহার করে থাকলেও যদি তার বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে, সে যদি অর্থগৃধ ও প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হয় তাহলে তাকে আমিষ ভোজই বলা হবে। আর যদি মাংস ভোজী হয়েও কেউ স ম্পূর্ণ নিষ্কাম ও বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হয় তবে সেই লোকই যথার্থ নিরামিষাশী বলে গণ্য হবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

মেলার আয়োজকদের তরফে উজ্জয়িনীর কালেক্টর রাজেশ রাজোরা জানিয়েছিলেন যে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কুম্ভমেলায় স্নানকরাকে কেন্দ্র করে প্রতিবারেই সাধুসন্তদের ১৩টি আখড়ার মধ্যে চূড়ান্ত বিবাদ বাঁধে। এবার নাকি ওই ১৩টি আখড়া একসঙ্গে বসে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছে কারা কখন স্নান করবেন। এর ফলে স্নানকে কেন্দ্র করে এব ার বিবাদের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে বলে আশা করেছিলেন উজ্জয়িনীর কালেক্টর মশায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, খ ালসা পরিষদের ৩০-৩৫ জন সাধুকে ঝামেলা পাকানোরঅভিযোগে জেলে আটক করা হয়েছে। কারণ পূর্ব নির্ধারিত শর্ত ভেঙে তাঁরা আগে স্নান করার দাবিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ইট- পাথর ছোঁড়েন পুলিশকে লক্ষ্য করে। এক পুলিশ অভিসার সহ জনা কয়েক কনেস্টেবল সাধুদের হাতে প্রহৃত হয়ে ইতিমধ্যে হাসপাতালে।

আসলে স্নানে কে আগে কে পরে যাবে -- এ নিয়ে মতভেদ ও বিবাদ বোধহয় কখনই মেটার নয়। আধ্যাত্মিক পথের পথি, ভক্তিমার্গের যাত্রী তথা ক্ষমাধর্মের পুজারীরা নিজেদের মধ্যে এমন হানাহানিতে নামে যে, আমাদের মতো ঘোর সংসারীর াও তা দেখে তাজ্জববনে যায়। কাম - ক্রোধ - হিংসা - দ্বেষ - লোভ - মোহ থেকে মুক্ত হলেই না সাধু হওয়া যায়। মৃচ্ছ কটিক নাটকে আছে -- শিরোমুন্ডিতং তুন্ডং মুন্ডিতং কিমর্থং মুন্ডিতং / যস্য পুনশ্চ চিত্তং মুন্ডিতং সাধু সুষ্ট শিবস্তস্য মুন্ডিতম্। অর্থাৎ সাধু তুমি মাথা কামিয়েছ, মুখ কামিয়েছ, কিন্তু মন তো কামাওনি। তাহলে আদৌ কামালে কেন? দেখ, যার মন ঠিকমতো কামানো --- তার মাথা ও মুখও কামানো। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিই বড়ো কথা। চিত্ত শুদ্ধ না হলে কেবল রাঙানো ক াপড় পরে সাধুর বেশ ধারণ করলে কোন লাভ নেই।

শুনলাম শর্ত ভেঙে আখড়া পরিষদ এদিন আহ্বান ও অগ্নি আখড়ার সাধুদের আগে স্নানে বাধার সৃষ্টি করেন। শাহিস্নানে আখড়া পরিষদের সাধুরা প্রথম জলস্পর্শ করবেন তো অন্য আখড়া পরবর্তী স্নানের সুযোগ পাবেন। সাধু - সন্তদের এই স্নান কাণ্ড নিয়ে বিবাদ নতুন কোন ঘটনা নয়। প্রায় চারশো বছর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। কুম্ভের ইতিহাসের দিক দৃষ্টি

দিলে দেখা যাবে ১৬২১ সালে হরিদ্বারে প্রথম কুম্ভস্নান নিয়ে মতভেদ হওয়ার সুধু-সন্তদের আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে প্রচুর হতাহত হন। ১৬৯০-এ সন্ন্যাসী ও বৈরাগী - সাধুদের মধ্যে তুমুল বিবাদে উভয় পক্ষের শতাধিক সাধু নিহত হয়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে হরিদ্বারে ১৭৯৬ সালে। দুই আখড়ার সাধুদের মধ্যে কে প্রথম স্নান করবেন তা নিয়ে রক্তক্ষয়ী লড় াইয়ে পাঁচশত সাধু প্রাণ হারান। এছাড়া ১৮০৯ ও ১৮৭৯ সালেও হরিদ্বারে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের ফলে কয়েক হাজার সাধুর প্রাণহানি ঘটেছিল। এই মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনার পুনরাবৃত্তি এরপরও বহুবার ঘটেছে। সেসব কথা এ কলমচির 'মেলার মানুষ মানুষের মেলা' গ্রন্থে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

এছাড়া মেলার ভিড় ও ঠেলাঠেলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়াতেও চাপে পড়ে বহু সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়েছেন ব ারবার। গত বছরে অর্থাৎ ২০০৩ সালেও নাসিকের গোদাবরীতে কুম্ভস্নানে একই কারণে চাপে পড়ে ৪০ জন নারীপুষ প্র াণ হারান এবং আহত হন আরও ১৫০ জন পুণ্যার্থী। কিন্তু মৃত্যুর এই দীর্ঘ মিছিল কুম্ভমেলার মাধুর্যকে কিছুমাত্র ম্লান করতে পারেনি এযাবৎ।

কাল বৃহস্পতিবার। ২২ এপ্রিল। দ্বিতীয় শাহিস্নান। আশ্রম সূত্রে জানা গেল, রাত দু'টোর আশ্রমের তাঁবুতে আশ্রিত কুম্ভ যাত্রীদেরস্নানের জন্য রামঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। সঙ্গে থাকবেন আশ্রমের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা। কারণ ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত শিপ্রানদীতে শাহিস্নানে অংশ নেবেন বিভিন্ন আখড়ার সাধুসন্তরা। ঐ স্নানঘাটের ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতে পারবেন না সাধারণ পুণ্যার্থীরা। রামঘাটে পৌঁছনোর সমস্ত রাস্তাঘাট তখন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেবেন মেলার কর্তব্যরত পুলিশ প্রশাসন। অতএব মধ্য রাতে কিংবা বিকেলে স্নানের সুযোগ মিলবে সাধারণ পুণ্যার্থীদের -- এমনটাই ঠিক আছে আগে থেকে।

রাত জেগে হিন্দুস্থান টাইমস্ - এর ইন্দোর সিটি সংস্করণ পড়ছিলাম, একাকী। আশপাশের বিছানায় সবাই গভীর ঘুমে নিমজ্জিত।এমনকি, সঙ্গী বণ বসুও। ইচ্ছে ছিল, ঘন্টা দুই - আড়াই - এর জন্য আর ঘুমের দেশে পাড়ি না দেবার। কিন্তু তঁ াবুর আলো পর্যাপ্ত না হওয়ার কাগজ পড়তে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। তাই রাত বারোটা নাগাদ কাগজ বন্ধ করে অগত্যা শুয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ঘুম ভাঙে মেলাসঙ্গীর আচমকা স্পর্শে। রাত তখন দেড়টা। আগে - ভাগেই বণ বসু স্নানে বেনোর জন্য প্রস্তুত। শাহিস্নানের পুণ্য হাতছাড়া করার কিছুমাত্র সুযোগ দিতে ইচ্ছুক নন তিনি।

ঠিক দুটো নাগাদ প্রতিটি তাঁবুর বাইরে কাঁসর বাঁজিয়ে কুম্ভযাত্রীদের মাঝরাতের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলেন আশ্র মের কর্তব্যপরায়ণ সতর্ক স্বেচ্ছাসেবকরা। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁবুর সবাই গিয়ে উপস্থিত আশ্রমের অস্থায়ী মন্দির প্রাঙ্গণে। আশপাশেৰসদ্য ঘুমভাঙা চোখগুলি তখন শাহিস্নানের দুর্লভ পুণ্য প্রত্যাশায় চকচক করছে। বিশেষ মুহূর্তে শিপ্রাতে কোনমতে একটা ডুব দিয়ে কুম্ভের সবাই যেন ঝুড়ি ঝুড়ি পুণ্য সঙ্গে নিয়ে যাবার লোভে ভিতরে ভিতরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ। রাতভেজা দেহে এ অধমও দাঁড়িয়ে এইসব পুণ্যপ্রত্যাশী মানুষের ভিড়ে।

চোখ রাখি আবার ইতিহাসের পুরনো পাতায়। বৈদিক ভারতের গৌরবময় অধ্যায়। আর্য - ঐতিহ্যের পরম্পরা। ইউরে াপীয় ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছিলেন, আর্যগণ মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন যীশু খৃষ্টের জন্মের তিন - চার হাজার বছর আগে। ইউরোপ যেহেতু তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বিষয়ে উন্নত ছিলো -- তাই তাঁদের কথাই ঝি জুড়ে সবাই এককথায় মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আধুনিক পণ্ডিতগণের বক্তব্যে জানা গেছে, যে স্থানে আর্যদের প্রাচীন বাসস্থ ান বলে আন্দাজ করা হয়েছিল তা চিরকালই মনুষ্যবাসের অনুপযোগী ছিল। তুষারাচ্ছন্ন, তৃণাচ্ছাদিত, প্রাকৃতিক দুযে োগপূর্ণ ঐসব অঞ্চলে মানুষের পক্ষে সুস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই কঠিন ছিল। ফলে সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রকাশ করা কখনে াই সম্ভব ছিলো না। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, কৃষিকার্যের উপযুক্ততা তথা ছয় ঋতুর প্রাকৃতিক আশীর্ব াদপুষ্ট আর্যাবর্তেই মূলতঃ সর্বপ্রথম সভ্যতার পত্তন হয়। কবির কথায়, 'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে।'

আর্যগণ ঋক্বেদের কিছু অংশ রচনা করে তবে ভারতে এসেছেন -- ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এরকম অনুমানও সম্ভবতঃ সঠিকনয়। কারণ এটা কোনভাবেই ভাবা যায় না যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর্যজাতি বন্ধুর পথযাত্রার কোন বিবরণ, কোনও অভিজ্ঞতার কথা বেদে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন না। পরন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিগণ এটাও সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেননি যে, ঋক - সাম - যজু - অথর্ব এভাবে আলাদা আলাদা করে বেদ রচিত হয়নি। সম্পূর্ণ বেদ ক্রমান্বয়ে রচিত হয়ে একসঙ্গেই ছিলে া। পরে তাকে ভাগ অর্থাৎ এখনকার কথায় নতুন করে সম্পাদনা করা হয়েছে। আর ঠিক এ কাজটির জন্যই কৃষ্ণ - দ্বৈপ

য়নকে পরে বেদব্যাস আখ্যা দেওয়া হয়।
ভ্রমণ প্রিয় পাঠক হয়তো এই কলমচির এহেন তত্ত্বতাড়িত আলোচনায় রীতিমত ক্লান্তিবোধ করছেন। হ্যাঁ, এমনটি বোধ কর াই স্বাভাবিক এবং এ অধম পাঠক হলেও এতক্ষণে ঠিক আপনাদের মতো অবস্থাই হতো নিঃসন্দেহে। এ যেন ঠিক ধান ভ াঙতে শিবের গাজন। কুম্ভমেলার সঙ্গে আর্যদের বাসস্থান নিয়ে গবেষকদের কচকচানির সম্পর্ক কি বাপু? সম্পর্ক হয়তো নেই, আবার হয়তো আছেও। সুতরাং আমাদের পুরনো ধ্যান - ধারণাকে একটু সংশোধন করার সুযোগ নেব না কেন? প্রাচীন অবন্তিকার সঙ্গে তাই আর্যদের অকথিত কথাও একটু শোনা যাক্।
বৈদিক সমাজের বয়স সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। তবে বেদ ও তন্ত্র প্রায় পাশাপাশিই চলেছে এবং এদেরকে তাই অ াগম - নিগম বলা হয়। দু'জন যমজ না হলেও একই বয়েসী। ম্যাক্সমূলার, ইউন্টার নিজ, ডেভিস-- এঁরা কেউ বলেছেন তিন হাজার, কেউ পাঁচ হাজার। তবে আধুনিক গবেষকগণ প্রাসঙ্গিক যুক্তি -- প্রমাণের দ্বারা স্থির করেছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার একশো বছর আগে এবং ভারতীয় সভ্যতা, আর্যসভ্যতার বয়স প্রায় ত্রিশ হাজার বছর। এই হিসেব মতেই পৃথিবীর সর্বত্র গীতাজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। তবে রাশিয়ার এক গবেষক পণ্ডিতের মতে, বৈদিক সভ্যতার বয়স ষাট হাজার বছরও হতে পারে। নয়া দিল্লির এনবিটি থেকে প্রকাশিত 'চম্সম্সন্দ ঠম্সজন্দ্ধন্দ্বজ' (১৫তম সংস্করণ, ১২ পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯৫) - এ স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'But Another Scholar, Madame Blavatsky, says that the planetary position described in the Vedas repeats itself every 6,000 years. So how can we be sure that the Vedas were not written 60,000 years ago? She personally was of opinion that they were written in an extremely remote past.'
এই দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের বৈদিক সভ্যতার ধারা একটানা প্রবাহিত রয়েছে। এই সভ্যতা পূর্ণ বিকশিত হবার পর এশিয় ায়, গ্রীসে, রোমে সভ্যতার দীপ জ্বলেছিল। সে সব দীপই একে একে নিভে গেছে। সুধু বৈদিক সভ্যতাই উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে আছে। মেসোপটেমিয়ায়, মিশরে, পারস্যে, এশিয়া মাইনরে, এথেন্সে, রোমে প্রাচীন সভ্যতার স্ফুরণ ঘটেছিল। সেসব সভ্যতা এখন কোথায়? জার্মান ফরাসি ইংরেজ ও আমেরিকানদের সভ্যতা সে তুলনায় নিতান্ত শিশু। মহাকালের বিচারে তারা উত্তীর্ণ হবে কিনা সেকথা বলার সময় এখনও আসেনি।
প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, বর্তমান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যে জটিলতা, লোক - লালসা, বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা ও হীন প্রবৃত্তি সমূহের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যা আবালবৃদ্ধবনিতাকে নিয়ত কামনা - বাসনা - ঈর্ষা - দ্বেষ - দ্বন্দ্বের পথে হাঁটার জন্য তাড়িত করছে --- তার উদ্ধারের মন্ত্র আছে আমাদের প্রাচীন বৈদিক সভ্যতাতেই। পৃথিবীতে কোনওদিন যদি এই সভ্যতা লোপ পায় তো মানবসভ্যতার প্রান - ভোমরাটিই লুপ্ত হবে একথা অস্বীকার করার মতো কোন কারণ এখনও অ ামাদের জানা নেই।
অথচ গত প্রায় এক হাজার বছর ধরে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ও সভ্যতার ওপর ক্রমাগত আঘাত এসেছে। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনির মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছিল, মন্দিরে পবিত্রতা রক্ষা করতে পঞ্চাশ হাজার ভক্ত নরনারী প্রাণ দিয়েছিল। তবুও লুণ্ঠনকারীরা শিব বিগ্রহ চূর্ণবিচূর্ণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি। ভারতের সিংহভাগ মানুষের ধর্ম ঐতিহ্য ও সমাজের ওপর বহিরাগতদের নিরন্তর আক্রমণের শু সেদিন থেকেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অত্যাচ ার ও নিপীড়নের রথচক্র চালিয়েছে বহিরাগতশাসকরা।
কালক্রমে ভারতের মুসলিম রাজত্ব জীর্ণ পতনোন্মুখ হলে খৃষ্টানশক্তি এদেশকে দখল করে নিয়েছিল। প্রথমে এসেছিল পে ার্তুগিজরা। তাঁদের অগ্রদূত ভাস্কো - ডা- গামা কালিকট বন্দরে জাহাজ থেকে অবতরণের ক্ষণ থেকেই স্থানীয় সংখ্যাগু ম ানুষদের অত্যাচার,নিপীড়ন, এমন কি, হত্যা করা শু করে। পরে যখন বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, তখন থেকে হিন্দু মুসলম ান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস জন্মানোর সর্বাধিক প্রয়াস চলে এসেছে। বৃটিশ বিদায় নিয়েছে কিন্তু ওই প্রয়াস শুধু অব্যাহতই নেই, শতগুণে তা বর্ধিত হয়েছে। সমাজের অগ্রভাগ, যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় দীপ্তিমান, সর্বক্ষেত্রেই ক্ষমতার অধিকারী, শাসক ও বিরোধী; রাজনীতি মঞ্চে অধিষ্ঠিত -- তাঁরা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন এক অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করেছেন যে, ধর্মপ্রাণ নিরীহ মানুষওনিজেদের হিন্দু পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত, লজ্জিত; যেন হিন্দু হয়ে জন্মানোটাই অপরাধ।
প্রাচীন ভারতে মুনি - ঋষিরা শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষা দিতেন এবং আমরা কম বেশি সবাই জানি যে, অক্ষর প্রচল হবার অ

াগে মুখে মুখে বিদ্যার্জনের রীতি ছিলো। যথার্থ শ্রুতিধরদের সাহায্যে শাস্ত্রাদি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। যিনি বিদ্যা লাভ করতেন তিনিই ব্রাহ্মণ হতেন। মুনি-ঋষিরা বিদ্যা কুক্ষিগত করে রাখতেন বলে যে (অপ) প্রচার চলে তা ঠিক নয়। অনধিকারীর হাতে পড়লে তা অবশ্যই বিকৃতক হয়ে যেতে এবং হাজার হাজার বছর পরে আমরা তা পেতাম না একথা বলাই বাহুল্য।

আমরা জানি, কুক্ষেত্র যুদ্ধের আড়াই হাজার বছর পরে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। বুদ্ধদেবের পাঁচশো বছর পরে যীশু খৃষ্ট আর যীশুর ছয়শো পছর পরে হজরত মহম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। মহম্মদের দেড়শো বছর পরে শঙ্করাচার্য এবং আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীচৈতন্যদেব। এই হিসেবে অবশ্য সাহেবরা রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধ যে যীশুর সাড়ে পাঁচশো বছর আগে জন্মেছেন -- প্রথমদিকে একথা স্বীকার করতে চাননি সাহেব পণ্ডিতগণ। পরে অবশ্য পাথুরে প্রমাণ বেরিয়ে পড়ায় মানতে বাধ্য হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইউপোপীয় ঐতিহাসিকগণ বরাবরই যে প্রশ্ন নিত্তর থেকেছেন তা হলো, হাজার পাঁচেক বছরের প্রাচীন চীনপারস্য রোম ও গ্রীক সভ্যতার কাহিনী সূত্রে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক দেশেই সভ্যতা বিস্তারের আগে অন্য জায়গা থেকে কোন এক বীর বুদ্ধিমান জাতি এসেছেন এবং তাঁরাই সভ্যতার পত্তন করেছেন। পরবর্তীকালের গবেষণায় পাওয়া গেছে, এঁরাই ভারতবর্ষের সুসভ্য আর্যজাতি। ভারতের প্রাচীন বাসিন্দা এঁরা কোনকালেই যাযাবর ছিলেন না। এখান থেকেই তারা পরবর্ত্তীকালে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছেন। আর্যদের প্রাচীন বাসস্থান ছিলো পশ্চিমে সিন্ধু, পূর্বে গঙ্গা, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য -- এই অঞ্চলে। একারণেই প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত বাষার সঙ্গে ঐসব অঞ্চলের তৎক ালীন ভাষার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পরন্তু স্বামী বিবেকানন্দও একথা স্বীকার করেছেন। অধমের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। পাঠকের ইতিহাস - জ্ঞান সম্পর্কে কিছুমাত্র সংশয় নেই এ কলমচির। শুধু ব্যক্তিগত কৌতূহলের অংশীদার কর ার জন্যই ইতিহাসের এই নতুন দিকটি নিয়ে একটু আলোকপাতের ইচ্ছে জাগে। আর্য - অনার্যের দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের কল্পিত টানাপোড়েন নিয়ে নাটক - নভেল রচনার বৌদ্ধিক ও বাণিজ্যিক দায়িত্ব না হয় 'রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন' লেখকদের ওপরই থাক; আমরা বরং কুম্ভস্নানের ফাঁকে আধুনিক পণ্ডিতগণের বক্তব্য নিয়ে একটু - আধটু আলোচনা সেরে নিই।

ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের দ্রাবিড় সভ্যতা, উত্তর - পশ্চিমের গান্ধার সভ্যতা সহ অনেক প্রাচীন সভ্যতাই আর্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।দ্রাবিড় সভ্যতার পত্তন করেছেন অগস্ত্য মুনি। তিনি বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে গিয়ে দাক্ষিণাত্যে সব্যতার ভিত পত্তন করেন। এবং তারপর সারাজীবন দক্ষিণ ভারতেই কাটিয়েছেন। আর্যবর্তে আর ফিরে আসেন নি। ভারতীয় পুরাণে তার প্রমাণ স্পষ্ট।

মজার কথা এই, চীন পারস্য রোম ও গ্রীক সব্যতার মতো মেক্সিকোর প্রাচীন উপকথায়ও পাওয়া যায় -- প্রাচীনকালে বিদেশ তেকে একজন বীরপুষ এসেছিলেন তিনি দু'হাতে তীর চালাতে পারতেন। অসম্ভব তাঁর ব্যক্তিত্ব, সূর্যের মতোই তেজীয়ান সেই দিব্যপুষ। তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, মহাভারতের অর্জুনই কি এই বীর পুষ যিনি যুধিষ্ঠিদের অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে সসাগরা স্বদীপা পৃথিবীর পরিক্রমা করেছিলেন? মানবসভ্যতার সঠিক ইতিহাস বের করতে হলে এই তত্য মেনে নিতে আপত্তি কেন? অযৌক্তিক অনুমান আশ্রয় না করে আমরা বরং বিভিন্ন দেশের প্রাচীন উপকথার সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করি।

এখানে আরও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার, ভারতীয় সব্যতার প্রাচীনত্ব এবং আর্যদের বাসস্থানের ভৌগো লিক তথ্য পশ্চিমি পণ্ডিতগণ যে ঠিক করতে পারেন নি --- তার মূল্যে কিন্তু অজ্ঞতা নয়; আসলে তাঁদের ঈর্ষা ও অহঙ্কার। ভারতের আর্যসব্যতা যে গ্রীক রোম পারস্য চীন গান্ধার ও দ্রাবিড় সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন একথা তাঁরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ক্রমান্বয়ে তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বিশ্বের কাছে।

বৃটিশ আমলে ভারত সরকার প্রকাশিত ইমপিরিয়াল গেজেটারের চতুর্থ খণ্ডে ভেষজ দ্রব্যের ইতিহাস বিষয়ে জানা যায়, পশ্চিম ইউরোপে চিকিৎসা শাস্ত্রের সব শাখাই এসেছে ল্যাতিন লেখকদের বই থেকে। তার মধ্যে প্রাচীন গ্রীক উদ্ধৃতিও রয়েছে। ঐ গ্রীক ভাষার বইগুলি এসেছে প্রাচীন আরবি বই থেকে এবং যেসব আরবি বই থেকে ঐ তথ্য নেওয়া হয়েছে ত ার মধ্যে বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্‌রশিদের রচনাই প্রধান। এই আল্‌রশিদ ন' শো বত্রিশ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর বই স

স্প্রতি অনুবাদ করা হয়েছে। ভারতের চরক ও সুশ্রুতের উক্তি পাওয়া গেছে আল্‌রশিদের লেখায়। এই প্রসঙ্গে গেজেট ারের সাহেব সম্পাদকের সরস মন্তব্যটি লক্ষ্য করার মতো -- 'আমার মনে হয়, এখানে ঈশ্বরের একটা ষড়যন্ত্রের ব্যাপার চলছে। তিনি নিজে সর্ববিষয়ের চিকিৎসা - বিজ্ঞান ভারতে সূত্রপাত করে পশ্চিমের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন।'

বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, যীসু বেথ্‌লহেমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রাচের পণ্ডিতগণ তাঁকে আশীর্বাদ করতে সেখ ানে গিয়েছিলেন। প্রাচীন এশিরীর গ্রন্থ নির্ভর করে সন্ধান চালিয়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, এই প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ ছিলেন ভ ারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁরা নবজাতক যীশুকে আশীর্বাদ করতে বেথ্‌লহেমে গিয়েছিলেন সেসময়।

গ্রীক রোম চীন পারস্য -- সকল প্রাচীন সভ্যতাই বিলীন হয়ে গেছে। তাদের কোন যোগসূত্র নেই। সবই বিচ্ছিন্ন। একমাত্র আর্যাবর্তেই সেই হাজার হাজার বছর আগেকার বৈদিক সংস্কৃতি - ঐতিহ্য এখনও ক্ষীণভাবে ধরা আছে। আমাদের অতি (নাকিঅপ?) শিক্ষিত লোকেরা সেই ঐতিহ্যসূত্রকে কুসংস্কার বলে প্রচার করতে চান। অথচ ভারতীয় সমাজ সাধারণ বিজ্ঞ ানের পাশাপাশি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। এর সহায়তায় ভারতবর্ষ ধ্বংসকামী পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে। মৈত্রী - ভাবনাই বৈদিক জ্ঞানের শেষ কথা।

বলা বাহুল্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা নিয়ে এখন কতো না হৈ চৈ। অথচ প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীরা সে কথা জ ানতেন বলেই তাঁরা আমাদের শিখিয়েছিলেন বৃক্ষ নদী পর্বত গাভী সহ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কীটানুকীটের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে। আধুনিক শিক্ষিত মানুষ এতদিন এ মানসিকতাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে বিদ্রূপ - ব্যঙ্গ - কটাক্ষ করলেও বিজ্ঞান ধ ারণাকে গুত্ব দিলে আজ আবার নতুন করে বৃক্ষ রোপন উৎসব পালন করার কোন দরকার হতো কি? বিশ্বের চিন্তাশীল সমাজ বিজ্ঞানী সকলেই বৈদিক চিন্তাদর্শের প্রতি ক্রমশসশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করছেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সময় গড়িয়ে চলে তার আপন আঙ্গিকে। ধৈর্য আর প্রতীক্ষার সমান্তরাল পথ বেয়ে ঘড়ির কাঁটা এসে দাঁড়ায় আড়াইটার ঘরে। প্রতিটি মিনিট যেন অখণ্ড মূহূর্ত। প্রথমে মৃদু গুঞ্জন। তারপর চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শাহিস্নানের জন্য সমাগত য াত্রীদের মধ্যে। কারণ আশ্রম কর্তৃপক্ষ এইমাত্র খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছেন যে স্নানের জন্য রামঘাটে যাবার সমস্ত রাস্তা অ াচমকা বন্ধ করে দিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন। অথচ এমনটা পূর্ব নির্ধারিত ছিল না।

রাত শুধু হেঁটে যায় রাতের গভীরে। শিপ্রাতটে বিস্তৃত মেলার উদাসীন বিস্তারে রাশি রাশি উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ ঘন বিষাদে পর্যবসিত হতে থাকে। এতো কষ্ট করে এসেছি, শাহিস্নানে অংশ নিতে পারবো না। -- এই অরব ও অমোঘ জিজ্ঞাসায় উপস্থিত কুম্ভযাত্রীরা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া - চাওয়ি করতে থাকেন। তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থান। পুণ্যতোয়া শিপ্রা - সলিলে অবগাহনের সুতীব্র বাসনা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় সবার মুখেই বিমর্ষের ছাপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লগ্ন - ভ্রষ্টা কন্যাদের মতোই তখন স্নানার্থীদের অবস্থা।

মনে প্রশ্ন জাগে, তীর্থযাত্রায় কিংবা কোন পূণ্যতোয়া নদীতে বিশেষ লগ্নে স্নান করলেই যদি পাপমুক্ত হওয়া যায় তো অভিসন্ধিপরায়ণ অসৎ ব্যক্তিরা পাপকার্যে লিপ্ত হতে পিছপা হবে না? -- এ্যায়সা নেহি। জান - বুঝকে যো পাপ করেগা - - উস্‌কো জ্যায়াদা ভুগনে পড়ে গা। মার্কন্ডেয় মুনি নে বোলা ঃ ন দৈববলং আশ্রিত্য কদাচিৎ পাপ মা চরেৎ/ অজ্ঞানাৎ নশ্যতে ক্ষিপ্রং নোত্তরং তু কদাচন। অর্থাৎ দৈববল আশ্রয় করে কদাচ পাপ করা কর্তব্য নয়। পাপ অজ্ঞানকৃত হলে তবে তা জপতপ ক্রিয়াদির দ্বারা নষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানকৃত হলে তা শত ধর্মানুষ্ঠানেও ধবংস হয় না। তার ফল অবশ্যই ভুগতে হবে।

সাধুজির উত্তর পেয়ে অধমের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটে। বেদ ও পুরাণে এমনি শত সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন প্রাচীন মুনি - ঋষিগণ। কিন্তু আমাদের মতো শিক্ষিত ও ব্যস্ত মানুষদের তা পড়ার সময় কোথায়! বরং বেদকে 'ব্যাদ' বলে নিজেদেরকে 'আধুনিক' প্রতিপন্ন করতে উৎসাহ বোধ করি। কোন কিছুর বিরোধীতা কিংবা অস্বীকার করতে গেলেও যে সে সম্পর্কে ন্যুনতম পড়াশুনো দরকার --এই অপ্রিয় সত্যটিই আমরা ভুলে বসে আছি। বিজ্ঞান মনস্কতার দোহাই দিয়ে অপযুক্তিকেই যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর প্রবণতা ক্রমশঃ বাড়ছে।

ভারতীয় দর্শণ বেদ - নির্ভর। বেদ অর্থ জ্ঞান। বেদকে কেন্দ্র করেই এদেশে ধর্ম ও দর্শন চিন্তা গড়ে ওঠে। মিশরের মতোই হিন্দু সভ্যতা ধর্ম ও দর্শণ থেকে আলাদা কোন বস্তু নয়। এদের দর্শণ থেকে ধর্মকে কোনভাবেই বিযুক্ত করা যায় না। চিন্ত ার প্রচলন হিন্দুসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে ব্যাপকভাবে হয়েছিল। অবশ্য সেসবই ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ঋক্‌বেদের

দর্শণ ভাববাদী হলেও সেখানে জড়বাদী ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তার অনুসন্ধান সম্ভব।

আমরা এও জানি, ভারতীয় দর্শণ ও সমাজ চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশের ঘটনা গ্রীসের অনেক আগের। শোনা যায়, গ্রীসে যখন দর্শণচিন্তার সূচনার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হতে শু করেছে -- তখন ভারতে তা পরিপক্কতা লাভ করেছে। ভারতীয় দর্শনকে দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত মনে করা হয়। সনাতন ও অ-সনাতন ।এই ধারার প্রথমটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বেদ ান্ত, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য ও যোগ - এই ছ'টি পদ্ধতিতে। একে আবার ষড়দর্শনও বলা হয়। বেদান্তকে অনেক সময় উত্তর মীমাংসা নামেও অভিহিত করা হয়। তখন মীমাংসাকে বলা হয় পূর্ব মীমাংসা। এর মধ্যে পূর্ব মীমাংসা ও সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। সনাতন ধারাকে পুরোপুরি আস্তিক্য বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ সনাতন ধারার মধ্যে অন্ততঃ দু'টি -- স াংখ্য ও মীমাংসা নাস্তিক্যবাদী; আবার অ - সনাতন ধারার মধ্যে প্রধান দু'টি -- বৌদ্ধ ও জৈনতত্ত্ব নাস্তিক্যবাদী হলেও এই ধারার বৈষ্ণব দর্শন পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী।

না, ঈশ্বর - নিরীশ্বরের বিরস বাদানুবাদে ভ্রমণপ্রিয় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চায়না এ কলমচি। এটা আসলে রেল ল াইনের মতো পাশাপাশি চলা দু'টো পথ। দু'টো পথেই ভীষণ ভিড়। দেখা না - দেখার মাঝখানে ছোট্ট ভুবন বিশ্বাস। 'এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটা অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে, আপনাকে সে কে ান বলে এক্সপেরিয়েন্স ফেইথ্ বলতে পারি। যুগ যুগ ধরে এদেশের শ্রেষ্ঠ ঋষি ও তপস্বীবৃন্দ তপশ্চরণ করে যে প্রত্যভিজ্ঞা ল াভ করেছেন -- সেই প্রত্যভিজ্ঞাই প্রকৃত বিশ্বাস। বিশ্বাস শব্দের অর্থও তাই। বি (বিগত হয়েছে) শ্বাস যখন, শ্বাস চাঞ্চল্যের প্রতীক। চাঞ্চল্য রহিত অবস্থান, যোগদর্শনে যার নাম লব্ধ ভূমিকত্ব তারই নাম বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, 'বিশ্বাস হলো সচ্চিদানন্দের খেই।'

না, কুম্ভযাত্রীদের মনস্কামনা ব্যর্থ হয়নি। মুশকিল আসনের জন্য ছুটে এলেন সংঘের কর্মযোগী সন্ন্যসী স্বামী বিশ্বাত্মনন্দজি ওরফে দিলীপ মহারাজ। তিনি ছুটলেন দত্তাত্রেয় আখড়ার দায়িত্বে থাকা পদস্থ পুলিশ অফিসারের কাছে এবং সংঘাশ্রিত স্নানার্থীদের জন্য রফাও একটা হল মেলার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে। ফিরে এসে দিলীপ মহারাজ জানালেন, প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে নয়, ঘুরপথে দশ - বারো জনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পুণ্যার্থীদের স্নান সেরে নিতে হবে। কোনরকম শোরগে াল নয়। অগত্যা তাতেই রাজি সবাই। আশ্রমের উত্তর - পশ্চিম দিকের বাউন্ডারির টিন সরিয়ে স্নানার্থীরা যে যার অগ্রসর হলো পেয়ারা বাগানের পাশ দিয়ে। খুব বেশি হাঁটতে হলো না। সঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সংঘের জনাকয়েক স্বেচ্ছাসেবক। তাঁরাই আমাদেরকে নিরাপদে সঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। শিপ্রাতটের আলো - আধাঁরী নৈশ পথে আমরা নিঃশব্দে অনুসরণ করি তাঁদের। রামঘাটের চারদিক ঐ রাতেও লোকারণ্য। উজ্জ্বল আলোর রোশনাইতে রাতের অন্ধক ার উধাও। শিপ্রার দু'দিকেই স্নানরত অসংখ্য পুণ্যার্থী। যেদিকে চোখ যায় শুধু কালো কালো মানুষের মাথা।অক্ষয় তৃতীয় ার পুণ্যযোগে উজ্জয়িনীর শিপ্রা বক্ষে যেন সারা ভারতের পুণ্যলোভী মানুষের মহাঢল নেমেছে। একটিবার, শুধু একটিব ার শিপ্রার জলে গা ভেজালেই যেন সারা জীবনের জমে থাকা পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। লক্ষ কোটি মানুষের এই সনাতন বিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়। সত্য - মিথ্যা, পাপপুণ্য, বিশ্বাস - অবিশ্বাসের চোর াস্রোতে ক্রমশঃ ডুবতে থাকি নিজেরই অজান্তে। শতশহস্র বছরের ধ্যান - ধারণাকে যাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারেন অন ায়াসে -- এ অধম অন্ততঃ সে দলে নয়। একথা বুঝতে পারি শিপ্রাতটে দাঁড়িয়ে এবং তা জনসমক্ষে স্বীকার করতেও কিছুম াত্র সঙ্কোচবোধ হয় না উজ্জয়িনী ছেড়ে আসার পরও।

রাত তিনটে দশ। শাহিস্নানের দুর্লভ সুযোগ সামনে। ডানে - বাঁয়ে স্নানার্থীদের জটলার মধ্যেই বাগ দম্পতি ও তাঁদের বিপত্নীক বন্ধু চৌধুরীবাবু দ্রুত স্নান সেরে নিচ্ছেন। সঙ্গী বণ বসু শিপ্রার গলা জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্র উচচারণ করছেন। স্নান ার্থীদের কোলাহলে শ্রীবসুর উচচারিত মন্ত্রে কানে আসছে না, কিন্তু তাঁর ঠোঁট নাড়া দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। আরও অনেকেই স্নানের আগে পরে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে দু'হাত মাথায় ঠেকাচ্ছেন ভক্তিভরে। স্নানের পর অমৃত আস্বাদনের মতোই এঁদের চোখ - মুখে গভীর তৃপ্তির ছাপ। জানিনা, পৃথ্বিীর অন্য কোন ঐশ্বর্য ধনী - দরিদ্র, পণ্ডিত - মূর্খ, গৃহী - সন্ন্য াসীর মুখে এতটা অপার্থিব তৃপ্তি এনে দিতে পারে কিনা।

সাঁতার জানা নেই। তার উপর জলে - ডোবা সিঁড়ি প্রচণ্ড পিচ্ছিল। খুব সন্তর্পণে দ্বিতীয় সিঁড়িতে নেমে কোনমতে ডুব দিতে হল শিপ্রার শীতল জলে। তারপর পাড়ে উঠে দ্রুত ভেজা জামা কাপড় পাল্টে নেবার পালা। বণ বসু ও আমাদের তঁ

াবুর অন্যান্যরা তখনও জলে। সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা সতর্ক দৃষ্টি মেলে কেউবা ডাঙ্গায়, কেউ বা হাঁটা জলে স্নানার্থীদের কড়া পাহারা দিচ্ছেন। এঁদের দায়িত্ববোধ ও সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ হতে হয়। অন্যের জন্য গৃহসুখ ছেড়ে এমন নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাশ্রম দিতে আজও কিছু মানুষ যে আমাদের সমাজসংসারে আছেন -- এই ভেবে মানুষ হিসেবে গর্ব হয়। ঘন কালো মেঘের ফাঁকে এক ঝলক বিদ্যুতের মতো এঁরাই তো প্রকৃতপক্ষেমনুষ্যত্বের জাগ্রত প্রহরী। মূল্যবোধের সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যেও এঁদের স্বার্থশূন্য সেবাকর্মের কাছে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে।

মহিলাদের স্নানের জন্য আলাদা কোন ঘাট কিংবা কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। এই ভয়াবহ ভিড়ে তা করা কার্যত অসম্ভবও। ফলে পুষদের পাশাপাশিই অন্তর্বাসের আড়ালে আদিম বর্ণমালা ঢেকে মহিলারা দিব্যি স্নান করছেন। বন - ভূষণের মতোই লাজ - লজ্জা সাময়িভাবে শ্রিপ্রাতটে গচ্ছিত রেখে পুণ্যস্নানে অংশ নিতে কোন রকম দ্বিধাবোধ করছেন না। ভাবখানা এই, পরকালের পুণ্যের জন্য ইহকালে এটুকু 'সাহসী' হওয়া তেমন দোষের কিছু নয়। পুণ্যক্ষেত্রে রমণীর - লাজ বর্জন ছাড়া উপায়ই বা কি!

শাস্ত্রে নানা রকম নিয়মের স্নানপর্বের উল্লেখ আছে। যেমন শীতোদক স্নান। উষ্ণোদক স্নান, কাম্য স্নান, মানস স্নান, মন্ত্র স্নান, গায়ত্রী স্নান, কপিল স্নান, মৃত্তিকা স্নান, বায়ব্য স্নান, ভস্ম স্নান, সূর্যপ্রকাশ স্নান, ত্রিকাল স্নান, বেদোক্ত স্নান এবং পুরাণোক্ত স্নান। মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারামজি স্নানের সঙ্গে মনের পবিত্রতার কথা বলেছেন জোর দিয়ে। মহাত্মা ফুলেজিও স্নান বিধি নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। এরপও লাফিং থেরাপির মতো বাথিং থেরাপির দ্রুত বিস্তার এ দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে না কেন -- তা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার রাজনীতি সচেতন এক মধ্য বয়সের পুষ।

না, এবার আর ঘুরপথে নয়। সকাল - ছোঁয়া রাতের স্নিগ্ধতায় উজ্জয়িনী উজ্জ্বল। স্নান সেরে আমাদের গোটা দলটাই ফিরছিল মেলার প্রকাশ্য পথ ধরেই। রাস্তাঘাটের সর্বত্র ঘন লোক সমাগম দেখে বোঝার উপায় নেই যে রাত গলে প্রায় শেষের দিকে, কুম্ভমেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বোধহয় দিনরাতের এই গোলক ধাঁধা! প্রয়োগেও ঠিক একই কাণ্ড। তফাৎ বোঝা যায় নি। একমাত্র তাপমাত্রার বড়োমাপের তারতম্য ছাড়া। দিনের আলোকেও যথেষ্ট ম্লান মনে হয় রাতের আলোকবহর দেখে। রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদক ও সরবরাহকারী সংস্থার সাময়িক কর্মতৎপরতা দেখে প্রশ্ন জাগে, সারা বছর কেন এদের এমন দাগিদ থাকে না।

আশ্রমে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিই। তাঁবুর মধ্যে তখনও রোদের উৎসব শু হয়নি। ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমের দেশে পাড়ি জমিয়েছিলাম --- বুঝতে পারিনি। আশপাশের কোলাহলে ঘুম ভাঙে। বেলা আটটা নাগাদ আবার মেলা প্রাঙ্গণে বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ নেন বণ বসু। আশ্রম ছেড়ে বেশি দূর এগুতে পারা যায় না। ভিড় সামলাতে দত্ত আখড়া থেকে রামঘাটে পৌঁছানোর সমস্ত পথই বন্ধ করে দিয়েছেন মেলার সতর্ক পুলিশ প্রশাসন। শুধু মাত্র সাধুসন্তদের জন্যই মেলার সব পথ খোলা। সাধারণ পুণ্যার্থীরা আপাততঃ অপাঙ্‌ক্তেয়। সত্যি কুম্ভমেলায় না এলে গেয়ার গুত্ব বোঝা মুশকিল। মেলায় অবাধ বিচরণের জন্য পরের বার নিশ্চয় গেয়া ধারণ করার সাময়িক সিদ্ধান্ত নেবেন বণ বসু।

দলে দলে সাধুসন্ত তখনও শাহিস্নান সেরে ফিরছেন। বড় মাপের কোন কোন সাধুসন্ত বিত্তবান ভক্তের দামি গাড়িতে চেপে চলেছেন। কোন কোন গাড়ির স্টিয়ারিং - এ গেয়াধারী ডান হাত। বাঁ হাতের মুঠোয় মোবাইল -- 'কর লো, ভর লো কুম্ভ হৃদি মে' ... ইত্যাদি। মাঝারী মাপের কেউ বা জীপে কিংবা বাইকের সামনে। আর ছোটমাপের সাধুসন্তদের অনেকে ভক্তের বাইকের পেছনে। সাইকেলেও কাউকে দেখা যায়। অনেকেই অবশ্য মিছিল করে এগুচ্ছেন। পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুদেশ নেপাল থেকে আসা শত সাধবীদের পুরোযাত্রাপথই কোন এক আগ্রহী বিদেশি তাঁর মুভি ক্যামেরায় বন্দি করে রাখতে সচেষ্ট দেখা গেল। গেয়া পোশাকে আবৃত একদল সাধুসন্তের লম্বা মিছিলও চোখে পড়লো। জানি না, কোন্ সম্প্রদায়ের। 'শুধুমাত্র কিছু ছবি তুলবো' -- ক্যারোধারী বণবসুর এই একান্ত অনুরোধেও কুম্ভমেলার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার আমাদের আর এক পা -ও এগুতে দিলেন না। কোনও ফাঁক - ফোকর বের করতে না পেরে বিষণ্ণ মনে পুনরায় আশ্রমের দিকে পা বাড়াতে হয়। রোদের কড়া তাপের হাত থেকে আপাত নিষ্কৃতি পেতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার বাসনা জাগে আশ্রমের উল্টোদিকে আখড়ার সামনে। এদিকের রাস্তায় কিছুটা গাছ - গাছালি থাকায় গরম তুলনামূলকভাবে কম।বণ বসু আর বাইরে না থেকে তাঁবুতে ঢুকে পড়েন।

আজ ২২ এপ্রিল। উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় শাহিস্নান। সারা গায়ে ছাই মেখে দত্তাত্রেয় আখড়ার অসংখ্য নাগা সন্ন্যাসী শিপ্রার

শান্ত শীতল সলিলে শাহিস্নানের উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এদিন কমপক্ষে ১২ লক্ষ পুণ্যার্থীর স্ন
ান করার কথা। কিন্তুকার্যত ৫-৬ লক্ষ পুণ্যার্থী ২২ এপ্রিলের শাহিস্নানে শিপ্রার রামঘাটে জড়ো হন। এর আগে ৫ এপ্রিল
শাহিস্নানে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ। একমাস ব্যাপী পৃথিবীর এই বৃহত্তম মেলায় অন্তত চারকোটি পুণ্যার্থী হ
াজির হবেন বলে মনে করছেন মেলার অভিজ্ঞআযোজকরা। ভারত ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশ কি ধর্মের নামে এমন
সম্মিলিত হতে পারে?